

ওরা থেমে নেই, আপনি কেন থামবেন?

প্রযুক্তি মাফিয়ারা থেমে নেই। ঠিকই ওরা নিত্যনতুন অপকৌশলে চালিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসাত্মক আক্রমণ। যদিও বিভিন্ন প্রযুক্তি-উপকরণগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের স্বাস্থ্যহানি ও ব্যক্তিগত তথ্য চুরিসহ নানা অভিযোগ আজ প্রমাণিত। কিন্তু তাতে প্রযুক্তি মাফিয়াদের তালুব কি কিছু কমেছে?

ওরা থামে নি। আপনি কেন থেমে যাবেন-যখন বুঁকিতে আপনার সন্তান ও পরিবারের সুস্বাস্থ্য আর নিরাপত্তা? যখন ভার্টুয়াল মহামারী ক্রমশ সর্বনাশ ঘটিয়ে চলেছে আপনার আত্মীয়-বন্ধু-প্রতিবেশীদের? যখন বুঁকির মুখে প্রিয় দেশ ও জাতি?

সিকি শতাব্দী ধরে জাতিকে স্বপ্নে-আশায় উজ্জীবিত করেছে কোয়ান্টাম-মানবিকতার অভিযাত্রায় বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশ। এজন্যে চাই সুস্থ, উদ্যমী, আত্মবিশ্বাসী এক প্রজন্ম। কিন্তু প্রযুক্তির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে অসুস্থ ও হীনম্মন্য মানুষ দিয়ে কীভাবে গড়ে উঠবে সেই নৈতিক মহাসমাজ?

তাই ২০০৯ থেকেই দেশবাসীকে সচেতন করে তুলছে কোয়ান্টাম। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ থেকে শুরু হয়েছে বিশেষ ক্যাম্পেইন। শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অফিসে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় সচেতনতামূলক সেমিনার। পাশাপাশি ব্যক্তি-উদ্যোগে এই বাণী ছড়িয়ে গেছে দেশের লাখে পরিবারে। তারা মুক্ত হয়েছেন মাদকের চেয়েও ভয়ানক ফেসবুক-ইন্টারনেট-স্মার্টফোন আসক্তি থেকে।

অতএব সর্বতো চেষ্টায় চলমান রাখতে হবে আমাদের এই কল্যাণ প্রয়াস। বাড়াতে হবে কর্মতৎপরতা। সর্বপ্রথম নিশ্চিত করুন ফাউন্ডেশনে আপনার নিয়মিত সম্পৃক্ততা। এতে শোষকদের সাম্প্রতিক ফাঁদগুলো সম্পর্কে নিজে যেমন জানবেন, তেমনি সচেতন করে তুলতে পারবেন পরিচিতদেরও। সবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সচেতন প্রয়াসেই এগিয়ে যাবে জাতি। সমৃদ্ধ হবে প্রিয় বাংলাদেশ।



ভার্টুয়াল ভাইরাসের ভয়াবহতা ও আসক্তি সম্বন্ধে সচেতন করতে ফাউন্ডেশন প্রকাশিত স্টিকার, ফোল্ডার, কণিকা ও ভিডিও সংগ্রহ করুন। পৌঁছে দিন পরিচিত পরিমণ্ডলে।



আপনার দেহ-মন সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে আপনাকেই

সুস্থ দেহ-মন একজন মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। এর সুরক্ষায় মূল দায়িত্বটা নিতে হবে নিজেকেই। আর এ দায়িত্ব সম্পর্কে যিনি যত সচেতন তার সুস্থতা তত বাড়ে, অন্যদিকে যিনি যত উদাসীন ও খেয়ালি, দিন দিন তত বাড়ে তার অসুস্থতা। তাই আপনার দেহ-মন সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে আপনাকেই।

গত ৩ অক্টোবর ঢাকার আইডিইবি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে একথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক।

কোয়ান্টাম পরিবারের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন প্রয়াত চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও শিশুবন্ধু জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খানের একটি কথার সূত্র ধরে গুরুজী বলেন, স্যার বলতেন-‘এ যুগে মানুষ সারাজীবন ধরে যা রোজগার করে, জীবনের শেষ তৃতীয়াংশে এসে তা সে ব্যয় করে ডাক্তার, ওষুধ ও ক্লিনিকের পেছনে।’ বাস্তবতাও আসলে তা-ই। এবং এর অন্যতম কারণ হলো, নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অসচেতনতা ও দায়িত্ব নিতে অস্বীকার। কারো কারো ধারণাটাই এমন যে, ‘আমাকে সুস্থ রাখার দায়িত্ব ডাক্তার-হাসপাতালের।’ কিন্তু ডাক্তার, ওষুধ, হাসপাতাল হতে পারে তার নিরাময়ের সহযোগী শক্তি মাত্র। মূলত এ ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আজকের এত মনোদৈহিক স্বাস্থ্য-জটিলতার উৎপত্তি।

তিনি বলেন, পুঁজিবাদী আত্মসানের এই যুগে রূপচর্চা নিয়ে আমরা যতটা ব্যস্ত, শরীর-মনের প্রতি আমাদের মনোযোগ ততটাই কম। কিন্তু রূপচর্চার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো স্বাস্থ্যচর্চা। কারণ নিজের শরীর-মনের প্রতি আপনি যত ভালবাসা অনুভব করবেন তত এর যত্ন নিতে উদ্বুদ্ধ হবেন। তত সুস্থ থাকবেন, রোগমুক্ত থাকবেন। আর নিজের চেহারা ও শারীরিক গড়ন নিয়ে যদি হীনম্মন্যতায় ভোগেন, এ নিয়ে ভেতরে বিরক্তি ও

নেতিবাচকতা লালন করেন, তাহলে অন্যরা আপনাকে সম্মান করবে না। আপনার রূপচর্চাও আকৃষ্ট করবে না কাউকেই। বরং আপনি যখন নিজের অনন্যতাকে সম্মান করেন, পার্থিব অস্তিত্ব হিসেবে স্রষ্টা আপনাকে যে চেহারা-অবয়ব দিয়েছেন তা নিয়ে কৃতজ্ঞচিত্ত হন, সেই আত্মসম্মানবোধই আপনাকে সুস্থ এবং আকর্ষণীয় করে তোলে। এটাই চিরসত্য।

আমরা ইদানীং যেসব ভুল জীবনাচারের কারণে অসুস্থ হই, তার অধিকাংশই খাদ্যাভ্যাস-সংক্রান্ত। এজন্যে প্রথমত খাবারটা খেতে হবে গুরুরীয়ার সাথে, পূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে এবং নীরব মনোযোগে। তাহলে শরীর সেই খাবার থেকেই প্রয়োজনীয় পুষ্টি গ্রহণ করবে। দেহ থাকবে সুরক্ষিত। সাম্প্রতিক চিকিৎসা-গবেষণায়ও প্রমাণিত হয়েছে, এই নিয়মে খাবার গ্রহণ দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সুসংহত করে।

আর যত বিরক্তি নিয়ে খাবেন, খাওয়ার সময় টিভি সিরিয়াল দেখা কিংবা পরচর্চা-পরিনিদ্রা ও নেতিবাচক আলাপ করতে করতে খাবেন তত এসিডিটি বাড়বে, শরীর হয়ে উঠবে এসিডিক, যা ব্যাকটেরিয়া-সহ নানা জীবাণুর আত্মসানের পক্ষে অনুকূল। যার ফলে বাড়ে অসুস্থতার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত, মুখরোচক খাবার নয়, সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর খাবার খাবেন। অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর খাবার সর্বতোভাবে বর্জন করবেন।

এর পাশাপাশি কোয়ান্টাম ইয়োগা ও অন্যান্য সুস্থ জীবনচর্চা এবং ইতিবাচক জীবনদৃষ্টি আপনাকে রাখবে সব দিক থেকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, উদ্যমী ও প্রাণবন্ত। আর সার্বিক সুস্থ জীবনের জন্যে সবসময় পরম করুণাময় স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করবেন-প্রভু হে! আমার সুস্থতার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করছি। আমি নিজেকে সুস্থ রাখতে চাই। তুমি আমাকে সাহায্য করো।

ব্যথা ভালো হবে না কেন?

অধ্যাপক ডা. বজলুল করিম



তিন বছর ধরে ডান গোড়ালির ব্যথায় ভুগছিলাম। দেশে-বিদেশে চিকিৎসার পর জানা গেল, ওখানে টিবি হয়েছে। একবছর ধরে টিবি চিকিৎসা চলেছে। কিন্তু ব্যথাটা কমছিল না। হাসপাতালে আমি ছইল চেয়ারে বসে রাউন্ড দেই। বাসায়ও আমাকে দুটো ক্রাচ ব্যবহার করতে হয়।

কিছুদিন আগে আমার এক ছাত্রী এ কোর্সে অংশ নেয়। সে বলল, স্যার, মেডিটেশন করুন, ব্যথা চলে যাবে। এক রোগীর মা-বাবা বললেন তারা এ কোর্স করে উপকৃত হয়েছেন। তারপর এক আত্মীয় প্রায় জোর করে আমাকে এখানে ভর্তি করিয়ে দিলেন।

গতকাল কোর্স থেকে ফিরে আমি হাসপাতালে রাউন্ড দিয়েছি ছইল চেয়ার ছাড়াই, একটা ক্রাচে ভর দিয়ে! নিরাময়ের এই কোয়ান্টাম প্রক্রিয়া আমি চর্চা করে যাব এবং আমার বিশ্বাস, ক্রাচটাও ফেলে দিতে পারব। ব্যথা ভালো হবে না কেন?

আগে আমার সংশয় ছিল যে, এটা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কিনা। কিন্তু চার দিনে যা শুনলাম, দেখলাম-এটা শতভাগ ইসলামসম্মত বলে আমি বিশ্বাস করি। আরো একটা দ্বিধা ছিল-এটা বিজ্ঞানসম্মত কিনা। মস্তিষ্কের কর্মপ্রক্রিয়ার আলোকে গুরুজী যেভাবে কোয়ান্টাম মেথডকে ব্যাখ্যা করলেন তা অতুলনীয়।

এখান থেকে ফিরে গিয়ে আমি ছাত্র ও সহকর্মীদের বলব-কোয়ান্টাম মেথড পুরোপুরি একটি ইসলামসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া।

[অধ্যাপক ডা. এ. এস. এম. বজলুল করিম। বিএসএমএমইউ-এর শিশু পুষ্টি ও পরিপাকতন্ত্র বিভাগের প্রধান। ৪৫০ তম ব্যাচের প্রত্যয়নে তিনি একথা বলেন।]

কোয়ান্টাম মেথড

৪৫২ তম কোর্স ৯ ডাকা

১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ নভেম্বর
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স
বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

দেশের বিশিষ্ট প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গাইনি বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. সায়েবা আক্তার। চিকিৎসাবিজ্ঞানের একনিষ্ঠ এ কর্মীর উদ্ভাবিত সায়েবা'স মেথডের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে উপকৃত হচ্ছেন লাখো মা। সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর ফিস্টুলা আক্রান্ত দুস্থ নারীদের সুচিকিৎসার জন্যে পেনশনের পুরো অর্থ ব্যয় করে তিনি ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন মাম'স ইনস্টিটিউট অব ফিস্টুলা এন্ড ওমেনস হেলথ। ১ অক্টোবর কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনার ৮০ তম পর্বে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন। তার আলোচনার নির্বাচিত অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

আমরা সচেতন হলেই সমাজে পরিবর্তন আসবে

অধ্যাপক ডা. সায়েবা আক্তার



২০০০ সাল। আমি তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের গাইনি বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। সে-সময় গাইনি ওয়ার্ডে প্রসবকালে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে একটি মেয়ে মারা গেল। ডাক্তার নার্স সবাই মিলে আমরা খুব চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই রক্তক্ষরণ বন্ধ করা গেল না। সেই রাতে আমি ঘুমাতো পারলাম না। বার বার মনে হচ্ছিল-১৮ বছরের মেয়েটি মা হতে গিয়ে এভাবে মারা গেল, আমরা কিছুই করতে পারলাম না!

সন্তান জন্মদানকালে পৃথিবীতে যত মা মারা যায়, তাদের প্রতি তিন জনের একজনের মৃত্যুর প্রধান কারণ অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ। আমাদের দেশেও শতকরা ৩১ ভাগ মাতৃমৃত্যুর কারণ এটি। এসময় মায়ের রক্তপাত বন্ধ করা সম্ভব হলেই তাকে বাঁচানো যায়।

এ বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এক ধরনের বেলুন দিয়ে রক্তপাত বন্ধের কৌশল শেখানো হয়েছিল আমাদের। ইংল্যান্ড থেকে আনা সেই বেলুনটির দাম ৩০০ ডলার, কিন্তু মাত্র একবারই এটি ব্যবহার করা যাবে। আমাদের মতো একটি দেশের জন্যে যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে যেদিন মেয়েটি মারা গেল, আমার শুধু মনে হচ্ছিল, বেলুনটি থাকলে হয়তো আজ মেয়েটি প্রাণে বেঁচে যেত। এরকম নানান চিন্তায় আমি আচ্ছন্ন, হঠাৎ মনে হলো-কনডম তো একটা মেডিকেল টুল আর এটি সুলভ ও সাশ্রয়ী। বেলুনের জায়গায় তো এটাকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এ ঘটনার একদিন পরেই আমি ওয়ার্ডে রাউন্ড দিচ্ছিলাম। জানতে পারলাম, সিজারিয়ান অপারেশনে একজন মা মৃত সন্তান জন্ম দিয়েছেন, কিছুতেই তার রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না। এসব ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে জরায়ু অপসারণ করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এ রোগীর ক্ষেত্রেও সেই প্রস্তুতিই চলছিল। আমি অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে বললাম, শেষ একটা চেষ্টা করে দেখি। তারপর রোগীর জরায়ুতে একটি কনডম প্রবেশ করিয়ে তাতে স্যালাইন ভরে ওটা ফোলানো হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্তপাত বন্ধ হলো। রোগীটা বেঁচে গেল!

সহকর্মী ডাক্তারদের নিয়ে এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করলাম। একে একে ২৩ জন মৃত্যুপথযাত্রী প্রসূতি মায়ের ক্ষেত্রে আমরা এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলাম এবং সফল হলাম। আমাদের গবেষণার ফলাফল আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হলো। উদ্ভাবিত হলো সায়েবা'স মেথড। এরপর পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হলো এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্যে।

বর্তমানে বাংলাদেশ-সহ ভারত, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের গাইনি চিকিৎসায় ও মেডিকেল পাঠ্যসূচিতে কার্যকর ও সাশ্রয়ী পদ্ধতি হিসেবে সায়েবা'স মেথড অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এসব দেশে হাজার হাজার দরিদ্র

মায়ের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করছে এটা। আমাদের দেশের জন্যে যা অত্যন্ত গর্বের। আমি মনে করি, এখানে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই, এটা সম্ভব হয়েছে আমার রোগীদের আন্তরিক দোয়ার ফলে।

এদেশের মায়েরা অনেক দিক থেকে অসহায়। এই উপলব্ধিটা আমার হয়েছে মেডিকেল কলেজে পড়তে এসে। অবশ্য আমি কখনো ডাক্তার হতে চাই নি। কিন্তু আমার বাবার ইচ্ছে ছিল, চিকিৎসক হয়ে আমি মানুষের জন্যে কিছু করব। মূলত তার অনুপ্রেরণাতেই আমি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলাম। প্রথম দুবছর পড়াশোনায় কোনো অগ্রহ পাই নি। চলেও এসেছিলাম কয়েকবার।

কিন্তু থার্ড ইয়ারে যখন রোগীদের সংস্পর্শে এলাম, তখন থেকে আর কোনো দ্বিধা আমার মধ্যে কাজ করে নি। রোগীদের অসহায়ত্ব দেখে সিদ্ধান্ত নিলাম-এদের জন্যে আমাকে কিছু করতে হবে।

আজ জীবনের এই প্রান্তে এসে আমি মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করি। তারা যদি আমাকে উৎসাহ না দিতেন, তাহলে আমাদের দেশের অসহায় মায়েরদের জন্যে কিছু করার সুযোগ আমার হতো না। অভিভাবকদের সিদ্ধান্তগুলো কখনো কখনো সন্তানদের ভালো লাগে না। কিন্তু মা-বাবা যে কথাগুলো বলেন তা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বলেন।

প্রসূতি মায়েরদের জন্যে কাজ করতে গিয়ে আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, গর্ভকালীন সময়ে সারাক্ষণ বিশ্রাম নেয়াই হচ্ছে পরিচর্যা। এটি ভুল ধারণা। অতিরিক্ত পরিশ্রম যেমন গর্ভবতী মায়ের জন্যে ক্ষতিকর, তেমনি ক্ষতিকর অতিরিক্ত বিশ্রামও। স্বাভাবিক চলাফেরা ও দৈনন্দিন কাজগুলো করাই স্বাস্থ্যসম্মত। অনেকের ধারণা, সন্তানসম্ভবা মা-কে অনেক বেশি খেতে হবে। এটাও ঠিক নয়। মায়ের সুস্থতা ও শিশুর বিকাশে সাধারণ পুষ্টির খাবারই যথেষ্ট। আর মায়ের শৈশবকালীন স্বাস্থ্য তার গর্ভাবস্থাকে প্রভাবিত করে। তাই একজন কিশোরীর পুষ্টি-পরিচর্যার ব্যাপারে পরিবারকে মনোযোগী হতে হবে। কিশোরীর যত্ন নেয়ার অর্থ হলো, ভবিষ্যতে তাকে সুস্থ মা হতে সাহায্য করা।

এর পাশাপাশি দরকার নিরাপদ প্রসব। একজন চিকিৎসক হিসেবে বলব-মা-কে বাঁচিয়ে একটি সুস্থ শিশুর জন্ম দিতে পারা, পৃথিবীতে এর মতো আনন্দ আর হয় না। কিন্তু অদক্ষ ধাত্রীর হাতে অনিরাপদ প্রসবের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই মা ও শিশুর জীবন সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরিদ্র মায়েরাই হন এর শিকার। এতে বিভিন্ন দুর্ভোগ পোহাতে হয় তাদের।

এমনই একটি রোগ ফিস্টুলা। যার অন্যতম কারণ বিলম্বিত বা বাধাগ্রস্ত প্রসব। এ রোগীদের প্রস্রাব-পায়খানার ওপর নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তারা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতে পারে না, তাদের কেউ কাজেও রাখে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বামীরা তাদের ত্যাগ করে। অধিকাংশের জীবন কাটে অবহেলা আর বঞ্চনায়।

আমার সবসময়ই ইচ্ছা ছিল এই দুস্থ মায়েরদের জন্যে কিছু করার। এ লক্ষ্যেই গড়ে তুলি মাম'স ইনস্টিটিউট অব ফিস্টুলা এন্ড ওমেনস হেলথ। এখানে ফিস্টুলা রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেয়া হয়। ফিস্টুলার একমাত্র চিকিৎসা হলো অপারেশন। আর গাইনিতে যত অপারেশন আছে, তার মধ্যে এটা সবচেয়ে কঠিন। এ রোগটা যেহেতু গরিব মায়েরদেরই বেশি হয়, তাই এ-ক্ষেত্রে প্রায় সময়ই ডাক্তারদের নিজেদের টাকা খরচ করেই অপারেশন করতে হয়। ফিস্টুলা রোগীদের ও নিঃস্বার্থ এই ডাক্তারদের জন্যে আমি কোয়ান্টাম পরিবারের সবার কাছে দোয়া চাই।

আর আমাদের সকল রোগীর পক্ষ থেকে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম এবং রক্তদাতাদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ মাম'স ইনস্টিটিউটে রোগীদের জন্যে যে রক্তের প্রয়োজন হয়, তার শতকরা ৯০ ভাগই আমরা পাই কোয়ান্টাম থেকে। প্রসব-পরবর্তী রক্তক্ষরণ চিকিৎসায় প্রথম প্রয়োজন হলো রক্ত। তখন রক্ত না পেলে মা-কে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ে।

একটা সময় নিরাপদ রক্ত পাওয়া সহজ ছিল না মোটেই। সে-সময় পেশাদার রক্ত-বিক্রেতাদের কাছ থেকে রক্ত কিনতে হতো। এমনও হয়েছে, রোগী অপারেশন থিয়েটারে কিন্তু রক্ত কেনার সামর্থ্য তার পরিবারের নেই। আমরা ডাক্তাররাই তখন নিজেদের ঘড়ি, স্বর্ণের চেইন জমা রেখে রক্ত এনেছি। সময়মতো রক্ত না পাওয়ায় অনেক প্রসূতি মাকে বাঁচানো যায় নি-এরকম বহু দুঃসহ স্মৃতি আমাদের আছে।

স্বেচ্ছা রক্তদান, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েরদের পরিচর্যা এবং মাতৃমৃত্যু রোধে আমাদের সবার সচেতনতা প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, আমরা প্রত্যেকে সচেতন হলেই সমাজে আসবে কাক্ষিত পরিবর্তন।

অনুলিখিত

সম্ভবদ্বতা ॥ ভালো থাকার বৈজ্ঞানিক উপায়

নিজেকে প্রশ্ন করুন তো, ভরসা করার মতো পরিচিত কজন আছেন আপনার? সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে কজনকে পাশে পাবেন আপনি? কিছুদিন আগেও সমাজ জীবনের চিত্রটি ছিল ভিন্ন। যৌথ পরিবার, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীদের নিয়ে ছিল হৃদয়তাপূর্ণ পরিবেশ। বলা হয়ে থাকে, এ যুগে জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। অথচ সত্য হলো, সবার জীবনেই নিত্যনতুন যন্ত্র এসেছে অনেক কিন্তু কমেছে মানুষের সংস্পর্শ। সামাজিকতা এখন পরিচিতদের নিয়ে চটকদার কোনো রেষারেষি খেতে যাওয়া আর ছবি তোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এগিয়ে যাওয়ার নামে আমরা আসলে পিছিয়ে পড়ছি না তো?



বাংলাদেশের তরুণদের নিয়ে জরিপের ফলাফল

৯৭%

মনে করে মানুষ এখন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে

৮৯%

মনে করে সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে আসছে

৮৫%

মনে করে পারিবারিক দূরত্ব বাড়ছে

তথ্যসূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, জুলাই ২০১৭

কিন্তু বলছে ভিন্ন কথা-বয়োজ্যেষ্ঠদের তুলনায় এখন তরুণরাই বেশি নিঃসঙ্গ অনুভব করে। বিশ্বব্যাপী ৫৫ হাজার মানুষের ওপর চালানো এ জরিপ অনুযায়ী, ৭৫-এর অধিক বয়সীদের মধ্যে নিঃসঙ্গ অনুভব করেন ২৭% মানুষ। অন্যদিকে ১৬-২৪ বছর বয়সীদের মাঝে একাকিত্বের হার ৪০%!

ফোর্বস-এর মতে, এভাবে চলতে থাকলে নিঃসঙ্গতা হয়ে উঠতে পারে আগামী বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানসিক সমস্যা। কারণ সিংহভাগ মানসিক অসুস্থতার প্রধান উৎস এই একাকিত্ব বা নিঃসঙ্গতা। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অনুভূতি পরবর্তীতে হতাশা, বিষণ্ণতা, আত্মহত্যা-প্রবণতাসহ বিভিন্ন ধরনের মনোদৈহিক রোগের জন্ম দেয়। অর্থাৎ এর প্রভাব শুধু মনেই সীমাবদ্ধ নয়, দুরারোগ্য নানা রোগের কারণও এই নিঃসঙ্গতা।

বিশ্বের প্রথম নিঃসঙ্গ মন্ত্রী!



যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাপানে পাঁচ জনে একজন একাকিত্ব বা নিঃসঙ্গতায় ভুগছেন

অবস্থা এখন এতটাই বেগতিক যে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে একাকিত্ব-বিষয়ক একজন মন্ত্রী নিয়োগ দিয়েছেন তার দেশে। এ বছরের জানুয়ারিতে সংবাদ মাধ্যমগুলোতে আসতে থাকে এই চমকপ্রদ খবর। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাপানের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত একটি জরিপে উঠে আসে-প্রতি পাঁচ জনে একজন নিঃসঙ্গতায় ভুগছে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, এর কারণ হলো ভুক্তভোগীদের দুই-তৃতীয়াংশের জীবনেই ভরসা করার মতো কোনো মানুষ নেই এবং আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার ফলেই তাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে অনিরাপত্তাবোধ ও সীমাহীন শূন্যতা।

মানুষের সংস্পর্শে বাঁচুন, মেধাদীপ্ত হোন

যত বেশি মানুষের সাথে আপনার পরিচয় ও সখ্য হবে তত বাড়বে আপনার বুদ্ধিমত্তা। একথা বলছে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞান সাময়িকী *সায়েন্টেফিক আমেরিকান* (৭ মার্চ ২০১১)। জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের মস্তিষ্কে নিউরোন-সংখ্যা একই থাকে, বাড়তে শুধু নিউরাল কানেক্টিভিটি বা সংযোগায়ন। নিউরোনে নিউরোনে যত বেশি সংযোগ ঘটবে, তত বাড়বে আপনার মস্তিষ্কের সামর্থ্য। নতুন নতুন মানুষ আর বৈচিত্র্যময় ধারণা আপনার মস্তিষ্কে তৈরি করবে নতুন সংযোগ পথ। আপনি ভাবতে শিখবেন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে। আপনি হয়ে উঠবেন চৌকস, মেধাদীপ্ত।

এগিয়ে থাকুন সুস্থতার পথে

সাম্প্রতিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা বলছেন, মানুষের দেহে খাবার, পানি ও ঘুমের যেমন দৃশ্যমান প্রভাব রয়েছে, তেমনি সামাজিক সংযোগেরও রয়েছে বাস্তব প্রভাব। অর্থাৎ পুষ্টির খাবার যেমন সুস্বাস্থ্যের জন্য জরুরি তেমনি দেহ-মনকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখতে প্রয়োজন হৃদয়তাপূর্ণ সামাজিক যোগাযোগ।

সহজ কথায়, কোনো খাবারের ছবি যেমন ক্ষুধা মেটাতে পারে না বা দেহে পুষ্টি যোগাতে পারে না, একইভাবে ভার্চুয়াল জগতে যোগাযোগও পারে না মানুষের একাকিত্ব ঘোচাতে। ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস আর আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও মানুষে মানুষে প্রকৃত সংযোগ হয় না।

কানাডীয় মনোবিদ সুজান পিংকারের গবেষণা মতে, কারো সাথে মুখোমুখি সাক্ষাৎ ও আন্তরিক হাত মেলানোর মতো আপাত সাধারণ ঘটনায়ও ব্রেনে

অক্সিটোসিন প্রবাহের সূত্রপাত ঘটে, যা দেহে কার্টিসলের মাত্রা কমানোর মাধ্যমে স্ট্রেস কমায়। বাড়ায় সুখানুভূতি। তিনি বলেন, বাস্তবে পারস্পরিক যোগাযোগ মানুষের দেহে ডোপামিন হরমোন উৎপাদন করে, যা দেহে মরফিনের মতো ব্যথানাশক হিসেবে কাজ করে। শুধু তা-ই নয়, মমতাপূর্ণ বাস্তব যোগাযোগে বাড়তে দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনা।

গবেষণার উপসংহারে সুজান বলেন, পশ্চিমা বিশ্বে আত্মকেন্দ্রিকতার চর্চাই তাদের স্বাস্থ্যহানির অন্যতম কারণ।

নিয়মিত সাদাকায়ন-আলোকায়নে আসুন

সম্ভবদ্বতা ও সমমর্মিতার চর্চায় ভালো থাকুন আপনিও

সময় এসেছে সচেতন হওয়ার। আমরা সৌভাগ্যবান যে, সারাদেশে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সেন্টার-শাখা-সেলে প্রতি শুক্রবার আয়োজিত হচ্ছে সাদাকায়ন কার্যক্রম। সেন্টারগুলোতে প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আলোকায়ন। এসব প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আপনি পরিচিত হবেন নতুন নতুন মানুষের সাথে। হৃদয়তাপূর্ণ পরিবেশে হয়ে উঠবেন একে অন্যের ভরসাস্থল। যৌথ মেডিটেশনের পাশাপাশি পরিচিতদের সাথে আন্তরিক কুশল বিনিময় আপনাকে এগিয়ে দেবে সুস্বাস্থ্যের পথে।



হাস্যোজ্জ্বল ও সুখী মানুষের সংস্পর্শে যেমন আনন্দের অনুভূতি সঞ্চার করে, তেমনি নেতিবাচক ও দুঃখ ভারাক্রান্ত মানুষের সঙ্গ একজনকে করে তোলে ক্লান্ত ও বিমর্ষ। এ বিষয়টি এখন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে 'ইমোশনাল কন্টেজিন্স' বা আবেগীয় সংক্রমণ। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা ঘটে অবচেতনভাবেই। যেমন, কাউকে হাই তুলতে দেখে অনেকের হাই তোলার উপক্রম হয়। ব্রেনের 'মিরর নিউরোন' সংক্রান্ত গবেষণায় উঠে এসেছে চমকপ্রদ সব তথ্য। এই মিরর নিউরোন অন্যের আবেগ বা কার্যকলাপ অনুকরণ করে নিজের মাঝেও সৃষ্টি করে সেই একই অনুভূতি।

আর এ কারণেই কোয়ান্টামের সাথে যারা সম্পৃক্ত হন, বাড়তে তাদের ভালো থাকার অনুভূতি। শোকরগোজার মানুষের এই সংস্পর্শে একাত্ম হয়ে বাড়তে থাকে ইতিবাচকতা, আত্মবিশ্বাস ও প্রশান্তি। বিকশিত হয় সময়ানুবর্তিতা, সুবচন, শুদ্ধাচার ও বিনয়ের মতো গুণগুলো। তাই বলা যায়, বৈজ্ঞানিক নিয়মেই আমরা ভালো আছি। আমাদের সাথে আসুন, আপনিও ভালো থাকবেন।

তথ্যসূত্র : বিবিসি, দ্য ইকনোমিস্ট, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

কোয়ান্টাম মেথড ৪৫০ ব্যাচ ৥ গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স—নিজের যা আছে তা নিয়েই জীবন শুরু করা ও প্রশান্তি সুস্বাস্থ্য সাফল্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার এক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। ২৬ বছরে এসে অনুষ্ঠিত হলো কোর্সটির ৪৫০ তম ব্যাচ। জাতিধর্মনির্বিশেষে দেশের নানা প্রান্ত থেকে সমবেত কিশোর-তরুণ-প্রবীণ এতে অংশ নিয়েছেন। রোগ হতাশা ব্যর্থতা ভুলে তারা উপলব্ধি করেছেন মেডিটেশনের উজ্জীবনী শক্তিকে। তাদেরই কয়েকজনের নিরাময় ও সাফল্যের অনুভূতি এখানে দেয়া হলো।

প্রশান্তির সূত্র জেনেছি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে

আবুল হাসনাত রোবেল



কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের আলোচনায় মস্তিষ্কের ক্ষমতাকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মেডিটেশনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্রেন ওয়েভ তৈরি করে সুস্বাস্থ্য ও প্রশান্তির জন্যে কল্যাণকর যে কমান্ড দেয়া যায়, তা সত্যিই অসাধারণ। এই বিষয়টি পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত। সম্প্রতি একটি গবেষণা দলের সাথে এ সম্পর্কিত কিছু কাজ করায় বিষয়গুলো আমার কাছে আরো বিশ্বাসযোগ্য এবং স্পষ্ট হয়েছে।

গত ১০ বছর ধরে আমার মাইগ্রেনের সমস্যা ছিল। দেশে ডাক্তার দেখিয়েছি, ভারতেও গিয়েছিলাম। সেখানে কয়েক দফায় আমাকে ইনজেকশন দেয়া হলো। কিন্তু আমার মাথাব্যথা কমল না। এরপর বেলজিয়ামে পড়াশোনার জন্যে চার বছর ছিলাম। সেখানে চিকিৎসা করিয়েও কোনো লাভ হয় নি। এ কোর্সে এসে বুঝতে পারলাম, মাইগ্রেন হলো একটি মনোদৈহিক সমস্যা এবং কোর্সের এই চার দিন মেডিটেশন চর্চা করে আমার মাথাব্যথা চলে গেছে।

নিজের প্রশান্তির জন্যেও অনেক সূত্র জেনেছি এখন থেকে, যা অনুসরণ করলে জীবনে অতৃপ্তি-অশান্তি থাকবে না বলে আমি বিশ্বাস করি।

[সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়]

মুঠো ভরে আর ওষুধ খেতে হচ্ছে না

শারমীন খান

সেই স্কুলজীবন থেকে আমার মাইগ্রেনের ব্যথা ছিল। ৩৫ বছরের বেশি আমি এ সমস্যায় ভুগেছি। পেশাগত কারণে প্রতিদিন আমাকে কমপক্ষে তিনটি মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে হয় এবং সাধারণত ১৫ মিনিটের মধ্যে মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হয়ে যায়। এজন্যে নিয়মিত আমি মুঠো ভরে ওষুধ খেতাম। অথচ মেডিটেশন করে আমার মাথাব্যথা নেই। ওষুধও খেতে হচ্ছে না। এটা আমার জন্যে একটি আশ্চর্য ঘটনা।

দূর থেকে আমরা অনেকেই এ কোর্স সম্পর্কে নেতিবাচক অনেক কিছু মনে করি। আমার ক্ষেত্রেও এমন হয়েছে। একটানা পাঁচ বছর আমার বান্ধবী চেষ্টা করেছে যেন আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সটি করি। আর আমিও সবসময় চেষ্টা করেছি, আমার বান্ধবী যেন কোয়ান্টাম থেকে এবং মেডিটেশন থেকে দূরে থাকে। একপর্যায়ে আমিই উদ্বুদ্ধ হয়ে কোর্সে অংশ নিলাম। এখানে এসে আমার ভুল ধারণা দূর হয়েছে। কোয়ান্টামে না এলে আমি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা হয়তো কখনোই উপলব্ধি করতাম না।

[এসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, এন আর বি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড]



আমি আবার সামনে এগিয়ে যেতে পারব

শাহরিন রহমান

একবছর আগে আমার মা মারা যান এবং সেই থেকে আমার জীবনটা পুরোপুরি পাল্টে যায়। আমি কোনোভাবেই এই শোক কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। চোখ বন্ধ করলেই মায়ের কথা মনে পড়ত। খুব ছোটবেলায় আমি বাবাকে হারিয়েছি। আমার বাবা একজন শহিদ বুদ্ধিজীবী। মা তার জীবনের সবটুকু দিয়ে আমাদের দুই ভাইবোনকে বড় করেছেন।

তার মৃত্যুর পর আমি মানসিকভাবে এতটাই ভেঙে পড়েছিলাম যে, ডাক্তার-ওষুধ কোনোটাই কাজ করছিল না। কারণ আমি হাসতে ভুলে গিয়েছিলাম। কাঁদতেও পারতাম না। কারো সাথে কথা বলতাম না। এমনকি আমি ক্ষুধাও অনুভব করি নি অনেক দিন। আমার স্বামী-সন্তান আশ্রয় চেষ্টা করছিল যেন আমি স্বাভাবিক হয়ে উঠি।

এমন সময় আমার ছেলে কোয়ান্টাম সম্পর্কে জানতে পারে। তারই উৎসাহে আমি কোর্সে এলাম। আলোচনা এবং মেডিটেশন একপর্যায়ে আমার ভালো লাগতে শুরু করল। এখানে এসে অনেকদিন পর আমার ক্ষুধা পেয়েছে এবং কিছুটা খেয়েছি। আগে মাথাব্যথা করত, এখন তা-ও নেই।

পারিবারিক মেডিটেশনে আমি মা-কে অনুভব করেছি। কাঁদতে পেরেছি, তার জন্যে দোয়া করেছি। এখন আমি সুস্থ জীবনের বিশ্বাস ফিরে পেয়েছি। কোয়ান্টামের একজন সদস্য হয়ে বলতে পারি, আমি আবার সামনে এগিয়ে যেতে পারব। সত্যিই এ কোর্স আমাকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন উপহার দিল।

[অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তা]



কোরআনের শিক্ষাই এ কোর্সে প্রতিফলিত হয়েছে

মো. ইউসুফ



কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, ‘...নিশ্চয়ই আমি তোমাদের অনেক নেয়ামত দান করব, যদি তোমরা শোকরগোজার হও। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি হবে খুবই কঠিন।’ (সূরা ইব্রাহিম : ৭)

কোয়ান্টাম মেথড দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে এই শিক্ষাই মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে—শোকরগোজার হওয়ার শিক্ষা, কৃতজ্ঞচিত্তের শিক্ষা।

এ কোর্সের প্রতিটি আলোচনা এবং মেডিটেশনের সময় আমি বেশ মনোযোগী ছিলাম। আমি বলতে পারি, এখানে কোরআনের শিক্ষাই বার বার প্রতিফলিত হয়েছে।

শারীরিক-মানসিক সুস্থতার পাশাপাশি পারিবারিকভাবে সুখী হওয়ার পথও এখানে দেখানো হয়েছে, যা পালন করলে একজন মানুষ অবশ্যই সফল হতে পারবে। এ কোর্সে সততার গুরুত্বও বোঝানো হয়েছে সুন্দরভাবে। আল্লাহ এ সজ্ঞের সাথে আমাকে যুক্ত থাকার তৌফিক দান করুন।

[প্রাক্তন আরবি ভাষা প্রশিক্ষক, গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ সোসাইটি]

এখন আরো সুস্থ বোধ করছি

মো. আজগর

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আসার আগে আমি খুবই অসুস্থ ছিলাম। একেবারেই হাঁটাচলা করতে পারতাম না। সুস্থ হওয়ার জন্যে আমি প্রায় ২৫ লাখ টাকা খরচ করেছি। তবুও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কোনো রোগ ধরা পড়ে নি।

এমন অবস্থায় পরিচিত একজন আমাকে কোয়ান্টামের মাটির ব্যাংক দিলেন এবং সুস্থতার নিয়তে নিয়মিত দান করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। আমিও দান করতে শুরু করলাম।

এর কিছুদিনের মধ্যে আবার ডাক্তার দেখালাম। এবার তিনি আমার রোগ শনাক্ত করতে পারলেন। তিনি জানালেন আমার মেরুদণ্ডে টিবি হয়েছে এবং অপারেশন করতে হবে। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! সব ভালোভাবেই সম্পন্ন হলো। তখনই আমি এ কোর্সটি করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

কোর্সে এসে মেডিটেশন করলাম, এখন আমি আরো সুস্থ বোধ করছি। কারণ অপারেশনের পরও আমার হাতে ও পেটে প্রচণ্ড ব্যথা ছিল এবং পা দুটো প্রায়ই অবশ হয়ে থাকত। আল্লাহর রহমতে এই সমস্যাগুলো এখন আর নেই। আমি বিশ্বাস করি, নিয়মিত দান করে এবং মেডিটেশন করে আমি সুস্থ হতে পেরেছি।

[মৎস্য ব্যবসায়ী]



সহকর্মীর পরিবর্তন দেখে এই কোর্সে এসেছি

টুকি চাকমা



চাকরির পাশাপাশি আমি কিছু পড়াশোনাও করি। ফলে অফিস থেকে বাসায় ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। তারপর ভার্চুয়াল জগৎ তো আছেই। একটু সুযোগ পেলেই ইন্টারনেটে যেতে ইচ্ছে করত। এসব

कारणे আমার সন্তানকে সময় দিতে পারতাম না। ক্যারিয়ার ও পরিবারের প্রতি ঠিকমতো মনোযোগও দিতে পারছিলাম না।

এর মাঝে আমার এক সহকর্মীকে দেখে অবাক হলাম। আগে তাকে প্রায়ই চিন্তিত দেখতাম। কিন্তু সেদিন বেশ প্রশান্তচিত্তে কাজ করছিলেন। জানতে পারলাম, সম্প্রতি তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করেছেন। তার এই পরিবর্তনে আমিও আগ্রহ বোধ করি। এরপর তার সাথেই আলোকায়নে অংশ নিলাম, ভার্চুয়াল ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন হলাম। মনস্থির করলাম আমি কোর্সটি করব।

আমাকে অনেকেই বলেছে, কোয়ান্টামে কি নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের বিষয়গুলো শেখানো হয় বা এটা কি নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের মানুষের জন্যে? কোর্সে অংশ নিয়ে বুঝলাম, ধর্ম-বর্ণের কোনো ভেদাভেদ এখানে নেই। বরং কোর্সের প্রতিটি বিষয় সব ধর্মের সব মানুষের জন্যে প্রয়োজনীয়।

[সহকারী গ্রন্থাগারিক, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়]

রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছি

তাসলিমা আক্তার



দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে আমার ব্যাকপেইন ছিল। এর জন্যে বহু চিকিৎসা করিয়েছি। কোনো লাভ হয় নি। একপর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিলাম বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করা। কিন্তু আমার ছেলে রীতিমতো জোর করে

এ কোর্সে নিয়ে এলো। কোর্সে এসে মনোযোগ দিয়ে মেডিটেশন করলাম। ধীরে ধীরে কোমরের ব্যথা কমেতে শুরু করল। কোর্স শেষে মনে হচ্ছে, ব্যাকপেইন আমার কখনোই ছিল না!

এ-ছাড়া মেডিটেশনের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো মনের গভীরে ডুব দিয়েছি। এতে নিজের ভুল-ত্রুটিগুলো সহজেই ধরা পড়েছে। বিশেষত আমার রাগ-জ্বেরের পরিমাণ একটু বেশি ছিল, যা নিজের এবং পরিবারের বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করত।

মেডিটেশনে নিজের রাগ-ক্ষোভ অবলোকন করে বুঝতে পারলাম, এটা কত ক্ষতিকর। এখন রাগকে আমার নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছি। আসলেই কোয়ান্টাম এমন একটি প্ল্যাটফর্ম, যেখানে নিজের ভুলগুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়।

[উদ্যোক্তা]

সবার মেডিটেশন চর্চায় গড়ে উঠবে একটি সুন্দর দেশ

আহসান হাবীব



মেডিটেশন নিয়ে আমার কৌতূহল ছিল। কারণ সারা পৃথিবীতে এখন এটা নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে। ভারতেও এ নিয়ে প্রচুর কাজ হচ্ছে।

এ সম্পর্কে আমি পড়েছি এবং দেখলাম আমাদের দেশে মেডিটেশন নিয়ে কাজ করছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

একসময় ভাবলাম এই কোর্সে অংশগ্রহণ করা দরকার। আমি অবশ্য একা আসি নি। আমার বড় দুই বোন এবং আমার স্ত্রী-সহ আমার চার জন এই কোর্সে অংশ নিলাম।

এখন আমার মনে হচ্ছে, এ কোর্সটি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে করাই ভালো। তাহলে পারিবারিকভাবে মেডিটেশন চর্চা করতে যেমন সুবিধা হবে, তেমনি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বিষয়গুলো আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। তাই একা করার চেয়ে পরিবারের সবারই মিলে এ

কোর্সে অংশ নিলে উপকার আরো বেশি হবে বলে আমার ধারণা।

আরেকটি বিষয় আমার ভালো লেগেছে— গুরুজীকে আমার খুব হাস্যরসপ্রিয় একজন মানুষ বলে মনে হয়েছে। তার সেন্স অব হিউমার অসাধারণ। প্রতিটি আলোচনা আমি আগ্রহ নিয়ে শুনেছি। উপভোগ করেছি। কারণ আমি নিজেও রম্য-বিষয়ক লেখালেখি করি।

একসময় চীনের জ্ঞানী ব্যক্তিরা হাসতেন না। মনে করা হতো, দাঁত দেখা যাওয়া মানে সে মূর্খ বা তার জ্ঞানের অভাব রয়েছে। কিন্তু এখন দিন বদলেছে। জ্ঞানী হলেই গভীর থাকতে হবে, ব্যাপারটা তা নয়। গুরুজী অনেক মজা করে গল্পের মাধ্যমে কোর্সের বিষয়বস্তু আমাদের বুঝিয়েছেন। প্রতিটি বিষয়ের সাথে তিনি একটি করে উদাহরণ যোগ করেছেন, এতে আমরা সহজেই বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছি।

এখন আমার চাওয়া এটাই যে, বাংলাদেশের সবারই এখানে আসুন, মেডিটেশন করুন। তাহলে নিজের তো উপকার হবেই, দেশেরও উপকার হবে। আমরা সবাই সুন্দর একটা দেশ চাই এবং এর জন্যে মেডিটেশনের দরকার আছে বলে আমি মনে করি।

[স্বনামধন্য কার্টুনিস্ট ও রম্য সাহিত্যিক। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, মাসিক উন্মাদ]

সুস্থতা ও কল্যাণের জন্যে কোয়ান্টামে আসুন

মো. আব্দুল হালিম মামুন



আমাকে সবসময় বসে কাজ করতে হয়। ফলে গত কয়েক মাস ধরে আমি ব্যাকপেইনে ভুগছিলাম। এ-ছাড়া সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আমার হাত-পা খুব ব্যথা করত। ডাক্তারের পরামর্শে নিয়মিত

পেইনকিলার খেয়েছি। কিন্তু ব্যথা কমে নি।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে মেডিটেশন করতে শিখলাম। কোর্সের দ্বিতীয় দিন থেকে আমি উপকার পেতে শুরু করি। এখানে ১০ ঘণ্টা বসে ক্লাস করেছি কিন্তু আগে আধা ঘণ্টা পর পর চেয়ার ছেড়ে হাঁটাইটি করতে হতো। সকালেও ঝরঝরে অনুভূতি নিয়ে ঘুম থেকে উঠছি। আমার হাত-পায়েও আর ব্যথা নেই। আরো শিখেছি, মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারের মাধ্যমে নিজের নিরাময়ের পাশাপাশি অন্যকেও নিরাময় করা যায়।

আসলে যারা দূর থেকে এ কোর্সের সমালোচনা করেন বা নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন, আমি মনে করি তারা কোয়ান্টাম সম্পর্কে না জেনেই কথাগুলো বলেন। তাদের অনুরোধ করব, সুস্থতা ও কল্যাণের পথে নিজের জীবনকে এগিয়ে নিতে কোয়ান্টামে আসুন।

[সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, মাহাবুব গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ]

পরিবারের সবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে পারছি

তাসনিম আহমেদ সুমিত্রা



আগে সবকিছুতেই আমি বিরক্তি বোধ করতাম। কারো সাথে কথা বলতে চাইতাম না। যে কারণে আমার মা-বাবা এবং পরিবারে সবার সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। আর রাগ-ক্ষোভ তো ছিলই।

পরীক্ষার রেজাল্টও আশানুরূপ হচ্ছিল না। অথচ আগে আমি সবসময় ভালো রেজাল্ট করতাম।

একটুতেই রেগে যেতাম বলে সবাই বলত— আমাকে দিয়ে কিছু হবে না। একপর্যায়ে আমিও বিশ্বাস করতে শুরু করলাম এই কথাটা। সবদিক থেকে নেতিবাচকতা আমাকে আঁকড়ে ধরল।

কোর্সে এসে বুঝতে পারলাম, এতদিন ব্রেনকে আমি ভুল কমান্ড দিচ্ছিলাম, তাহলে কীভাবে পারব? আসলে ব্রেনের রয়েছে অপার ক্ষমতা। এখন আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি, আমার দ্বারা আবার ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব। পরিবারে সবার সাথে এখন ভালো ব্যবহারও করতে পারছি।

প্রতিটি মেডিটেশনের পরে আমি উপলব্ধি করেছি, আমার রাগের মাত্রা কমছে আর প্রশান্তি বাড়ছে। তাই বলতে চাই, এ কোর্সে অংশ নেয়া আমার জীবনের সঠিক একটি সিদ্ধান্ত।

[শিক্ষার্থী, অষ্টম শ্রেণি, উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : কোয়ান্টামে বলা হয়-যা চাই তা-ই পাব, আমি পারি আমি করব। এটা কি শিরক নয়?

উত্তর : এটা কীভাবে শিরক হলো? আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা হলে সেটাই হচ্ছে শিরক। এই যে আমরা বলি-আমি পারি আমি করব। এই 'আমি'টা কে? স্রষ্টার প্রতিনিধি। আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। কিন্তু যে অক্ষম, যার কিছু করার বা পারার সামর্থ্য নেই, প্রতিনিধির দায়িত্ব সে কীভাবে পালন করবে? এমন কেউ তো প্রতিনিধি হতে পারে না। আপনি কাকে নিজের প্রতিনিধি বানাবেন? যে আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে অর্থাৎ আপনার কাজগুলো যে করতে পারবে।

যখন একজন বলছে-'আমি পারি আমি করব', তখন সে আসলে স্রষ্টার প্রতি তার কৃতজ্ঞতারই প্রকাশ ঘটচ্ছে-আল্লাহ! তুমি আমাকে যে শক্তি আর পারার ক্ষমতা দিয়েছ, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তাই সবসময় মনে রাখবেন-'আমি' স্রষ্টার প্রতিনিধি। 'আমি' পারব না কেন? স্রষ্টাই তো আমাকে পারার ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি চাইলে তাঁর প্রতিনিধিও পারবে। আর নিজের শক্তি ও ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হলো আপনাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ওপরেই বিশ্বাস স্থাপন করা।

আসলে জ্ঞানের অভাব ও ভুল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আমরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাই। মানুষকে সত্য ও কল্যাণ থেকে শয়তান দূরে সরিয়ে রাখে এভাবেই। অতএব সবসময় সবকিছু মুক্তমন নিয়ে গুনবেন ও বিচার করবেন। তাহলে আপনি যে-কোনো বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারবেন। অন্তর্নিহিত সত্যটা বুঝতে পারবেন।

প্রশ্ন : আমি আমার মনছবি ঠিক করতে পারছি না। একবার মনে হয় বিসিএস পরীক্ষা দেবো। পরক্ষণেই মনে হয়, থাক, প্রাইভেট জব করব। আমি চাই-যে প্রফেশনেই থাকি, আমি যেন মানুষের কল্যাণে কিছু করতে পারি।

উত্তর : প্রথমত, একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন, জীবিকাটাই জীবন নয়। গত দুশ বছরের শাসনে ইংরেজরা আমাদের মধ্যে এই ধারণাটা ভালোভাবে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে যে, জীবন মানে শুধুই জীবিকা। অবশ্য তারা নিজেদের স্বার্থে যেটা করা দরকার মনে করেছে, সেটাই করেছে। কারণ চিন্তার গণ্ডি ও জীবনের অর্থটা ছোট করে দিলে আর হীনম্মন্য করে রাখতে পারলে মানুষকে দাস বানিয়ে রাখাটা অনেক সহজ হয়। শোষণ করা যায় সহজেই।

তাই এটা বুঝতে হবে যে, জীবিকাটাই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। সুন্দরভাবে জীবনযাপন করার জন্যে জীবিকা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এটা জীবনের একটা অনুষঙ্গ মাত্র।

দ্বিতীয়ত, আপনি আসলে কী চান? বিসিএস দেয়ার বা বিসিএস দিয়ে পাশ করার যোগ্যতা কি আপনি অর্জন করেছেন? প্রাইভেট জবের জন্যে যে যোগ্যতা প্রয়োজন, সেটা আপনার আছে কি? আসলে মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে বলে ভাবে, আকাশকুসুম কল্পনা করে। কিন্তু যোগ্যতা সৃষ্টি করে না। যদি এমন হতো, সরকারি বেসরকারি একাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে

আপনার কাছে এপয়েন্টমেন্ট লেটার এসেছে, তাহলে আপনি বলতে পারতেন যে, আমি এটা করব না ওটা করব। তাই আগে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কেন বিসিএস পরীক্ষা দিতে চাই? সবাই দিচ্ছে বলে? নাকি এটা আমার চূড়ান্ত লক্ষ্যের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ? এর জন্যে প্রাণান্ত প্রয়াস চালানোর ইচ্ছা কি আমার আদৌ আছে?

এসব প্রশ্নের উত্তর যদি আপনার কাছে থাকে, তখন আর কোনো সংশয় থাকবে না যে, আপনি কোথায় যাবেন বা কী করবেন। তা না হলে আমি যা বলব সেটা আপনার কিছুদিন ভালো লাগবে, তারপর মনে হবে-না, এটা নয়, ওটাই ভালো ছিল।

প্রশ্ন : আমি সনাতন ধর্মের অনুসারী। আমি একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছি। আমার সহকর্মীদের সাথে আমি সালাম বিনিময় করি। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি, আমাদের স্কুলের দুজন ধর্মীয় শিক্ষক আমাকে সালাম দেন না এবং আমি তাদেরকে সালাম দিলেও উত্তর পাই না। তারা অত্যন্ত কৌশলে সৌজন্য প্রকাশ করেন। আমার প্রশ্ন হলো, শুধু কি ইসলাম ধর্মের অনুসারীরাই একে অপরের সাথে সালাম বিনিময় করতে পারবে?

উত্তর : আসসালামু আলাইকুম কথাটার অর্থ হলো, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এই যে অন্যের জন্যে শান্তি কামনা-এটা আমাদের সংস্কৃতির অংশ এবং এটা সবাই করতে পারে। তবে সব ব্যাপারেই কিছু ভিন্ন মত আছে। কেউ হয়তো মনে করেন-না, এটা করা যাবে না।

আর ভাষা কখনো ধর্মের অংশ নয়, ভাষা হলো সংস্কৃতির অংশ। যেমন, 'শহিদ' শব্দটি এখন আর কোনো বিশেষ ধর্মের নয়, বরং শব্দটি আমাদের সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে। স্কুদিরামকেও আমরা শহিদ বলি। আবার বরকত, রফিক, জন্মারকেও আমরা শহিদ বলি। একইভাবে সালাম বিনিময়ও আমাদের সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে।

আরেকজনকে শুভকামনা জানানো বা তার জন্যে দোয়া করা-এটা নিঃসন্দেহে একটি ভালো কাজ এবং প্রত্যেক মানুষ এটা করতে পারে। তবে কেউ যদি সালামের জবাব না দেন, এই দায়িত্ব তার।

প্রশ্ন : ভর্তি পরীক্ষার ভয় কীভাবে দূর করব? একমাস মেডিটেশন করলে কি লিখিত পরীক্ষায় টিকব? ভাইভা পরীক্ষায় কথা বলতে পারি না। তাই পরীক্ষা দেয়ার সাহস পাচ্ছি না। এর আগে ভাইভা থেকে বাদও পড়েছি।

উত্তর : এ ভয়টা নিশ্চয়ই একদিনের নয়। দীর্ঘদিন ধরে যে ভয় আপনার ভেতরে তৈরি হয়েছে, তা দূর করার জন্যে আপনি একমাসের টার্গেট কেন করছেন? একটা সমস্যা যেতেও তো সময় লাগে। আপনি যদি সময় নির্ধারণ করে দেন, এটা টেনশন তৈরি করে। প্রতিমুহূর্তে আপনি চিন্তা করছেন, আমার ভয়টা দূর হলো কিনা বা কতটুকু দূর হলো?

যেমন, মুরগির ডিম থেকে বাচ্চা ফুটতে ২১ দিন সময় লাগে। এখন আপনি যদি বার বার ডিম উঠিয়ে দেখেন, তাহলে বাচ্চা ফোটার কথা থাকলেও তা নষ্ট হয়ে যাবে।

আপনাকে প্রথমে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে যে-হাঁ, আমি এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। এটা কয়েক মাসে হতে পারে, কয়েক দিনের মধ্যেও হতে পারে। কিন্তু বিশ্বাসের সেই জায়গায় আপনাকে পৌছতে হবে। যতক্ষণ আপনার মনে প্রশ্ন বা দ্বিধা থাকবে, সমস্যা দূর হবে না। তাই বিশ্বাসটাকে প্রবল করতে হবে-নিজের ওপর এবং স্রষ্টার ওপর।

সেইসাথে পড়াশোনা করবেন এবং যথাযথ প্রস্তুতি নেবেন। নিয়মিত মেডিটেশন করবেন। আপনার ভেতরের যে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা, এটা দূর হবে এবং পড়ালেখায় মনোযোগ এনে দেবে মেডিটেশন। তখন যা পড়বেন, আপনার মনে থাকবে। পরীক্ষার খাতায় আপনি লিখতে পারবেন এবং ভাইভা বোর্ডের সামনেও কথা বলবেন আত্মবিশ্বাসের সাথে।

প্রশ্ন : আমার আত্মীয়স্বজন অনেকেই গ্রাজুয়েট। কিন্তু কোয়ান্টামের বিভিন্ন প্রোগ্রামে আমার অংশ নেয়া ও লামায় যাওয়া-আসটা সবাই ভালোভাবে নেয় না। এসব ক্ষেত্রে কিছুটা মিথ্যা কথা বলা যাবে কি?

উত্তর : জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে সং থাকা উচিত। কারণ সং সাহসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনি ভালো কাজ করেন এবং ন্যায়ের পথে থাকেন, তাহলে কে কী বলল, তার কোনো গুরুত্ব নেই। এখন যা-ই করুক, পরে তারাই এটা ভালোভাবে নেবে, যদি আপনার মধ্যে বিশ্বাসের দৃঢ়তা এবং ইতিবাচক পরিবর্তন দেখে। আর এটা তখনই হবে, যখন আপনার বিশ্বাস আপনার জীবনের চেয়ে বড় হবে। তাই বিশ্বাসকে প্রবল করতে হবে। তাহলে আপনি সকল প্রতিকূলতা জয় করতে পারবেন।

চারপাশের অধিকাংশ মানুষই মনে করে, বেঁচে থাকাটাই জীবন। কিন্তু শুধু বেঁচে থাকাটাই জীবন নয়, কীসের জন্যে আপনি বাঁচবেন তা গুরুত্বপূর্ণ। কারো লক্ষ্য যদি জীবনের চেয়ে বড় হয়, তাহলে কোনোকিছুই তার পথে বাধা হতে পারে না।

কোয়ান্টাম সম্পর্কে যারা নেতিবাচক কথা বলে, তাদের সাথে কখনো বিতর্কে জড়াবেন না, রাগারাগি করবেন না। শুধু বলবেন, 'কোয়ান্টামে আমার ভালো লাগে। আমি শান্তি পাই বলেই সেখানে যাই। যেদিন আপনি বুঝবেন সেদিন নিজেই বলবেন, আমাকে নিয়ে চলো।' কারণ মানুষ যেখানে কিছু পায় সেখানেই তো যায়। সেই পাওয়াটা হতে পারে আত্মার পরিতৃপ্তি কিংবা মনের শান্তি।

মনে রাখবেন, জীবনে সাহসী হতে হবে। পৃথিবী সাহসী মানুষের জন্যে। আপনার বিশ্বাস যেন হয় আপনার প্রথম ভালবাসা। যদি বলতে পারেন-আমার বিশ্বাসই আমার প্রথম ভালবাসা, আমার প্রথম প্রেম-তাহলে আপনি অমর হবেন।

এ মাসের অটোসাজেশন

আমি সঠিক পথের অনুসারী।

প্রতিদিন আমার অন্তরের

আলো ও প্রশান্তি বাড়ছে।

অক্লান্ত কাজ করে যাওয়ার জন্যে চাই সুস্থতা

আবুল হায়াত

নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয় একটি নাটক ছিল *বহুব্রীহি*। ১৯৯০ সালের কথা সেটা। সেই নাটকে আমি ‘সোবহান সাহেব’ বলে একজন দানশীল ও হৃদয়বান ব্যক্তির চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম, যিনি মানুষকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করেন, বিপদে-আপদে আশ্রয় দেন।

নাটকটা যখন প্রচার হচ্ছিল, সে-সময় আমি একদিন বাজারে গিয়েছি। এক বৃদ্ধ ভিখারিনি এগিয়ে এসে সাহায্য চাইলেন। কিছু দেবো না জানিয়ে তাকে সরে যেতে বললাম। কিন্তু তিনি আমার পিছু ছাড়লেন না, চাইতেই থাকলেন। একসময় তার সবরকম উপরোধ-আকুতি উপেক্ষা করে আমি যখন বাজার শেষে গাড়িতে উঠতে যাব তখন পুনরায় তার কাতর অনুরোধ—‘একটা টেহা দ্যান না বাবা।’

এবার আমি কিছুটা ধমকে উঠলাম—‘এই! যান তো যান। টাকা দিতে পারব না, যান।’ আমার বিরক্তি দেখে মহিলা হতভম্ব। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—‘টিভিতে তো দেখি কত মাইনষের কত টেহা দেন, আমারে এই একটা টেহা দিতে এত কষ্ট!’

খুব কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন। ঘটনাটা আমাকে বেশ নাড়া দিল। অভিনয়ের শক্তিটা নতুন করে উপলব্ধি করলাম। এজন্যই আমি নাটক রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ কাউকে নেতিবাচকভাবে চিত্রিত করি না। যেমন, শাশুড়ি বা পুলিশের চরিত্র। কারণ অধিকাংশ দর্শক একেই বাস্তব হিসেবে ধারণা করে বসে। ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

আমার শৈশব কেটেছে চট্টগ্রামের রেলওয়ে কলোনিতে। তখন মা-বাবার সাথে বিভিন্ন নাটকের আসরে যেতাম। এভাবেই নাটকের প্রতি আমার ভালবাসা জন্মে। ১০ বছর বয়সে পাড়ার বন্ধুদের নিয়ে প্রথম *টিপু সুলতান* নাটকে অভিনয় করি। তারপর স্কুল, কলেজ, কলোনির অনুষ্ঠান-অভিনয়ের কোনো সুযোগই কোথাও হাতছাড়া করি নি। কিন্তু সবার মুখে শুনতাম শুধু একটা কথা—‘এই ছেলের অভিনয় তো অভিনয়ই মনে হয় না!’

আমার খুব মন খারাপ হয়ে যেত কথাটা শুনে। এটা কি প্রশংসা নাকি অন্য কিছু বুঝতাম না। এদিকে অভিনয়ের নেশাও পেয়ে বসেছে। বুয়েটে পড়াকালীন ইউনিভার্সিটির হলে বা অন্য কোথাও নাটক হয়েছে আর আমি অভিনয় করি নি, এমনটা কখনো হয় নি।

১৯৬৭ সালে পড়াশোনা শেষ হলো। প্রকৌশলী হিসেবে যোগ দিলাম ঢাকা ওয়াসায়। সেটাও নাটকের সাথে সম্পৃক্ত থাকার সুবিধার্থেই, কারণ এ চাকরিতে ঢাকার বাইরে বদলি নেই।

এর মধ্যে জিয়া হায়দার বলে একজনের নাম শুনলাম। তিনি *নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়* নামে একটি নাট্যদল গঠন করতে যাচ্ছেন। আমি যথারীতি যুক্ত হলাম। ওখানে গিয়ে বুঝলাম—আগে যা করেছি সবই না বুঝে, না জেনে। ভেতর থেকে যা এসেছে তা-ই করেছি। কিন্তু জিয়া হায়দার—আমার নাটকের শিক্ষাগুরু—তিনিই প্রথম শেখালেন প্রকৃত অভিনয়টা আসলে কী।

তিনি বলতেন, অভিনয় না করাটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ অভিনয়। ছোটবেলা থেকে আমার অভিনয় যে অভিনয়ই মনে হয় না, তা শুনে কষ্ট পেতাম। অথচ *নাগরিক*কে কাজ করতে গিয়ে বুঝলাম—ওটা স্রষ্টাপ্রদত্ত গুণ। আমি স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞ যে, এই গুণটা আমার সহজাত। সেই থেকে আমি সবসময় একে ধরে রাখার এবং বিকশিত করার চেষ্টা করেছি।

এভাবেই আমার নাট্যচর্চা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেল। সেই স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী

বিশিষ্ট নাট্যজন ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আবুল হায়াত। স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় দক্ষতার কারণে গত অর্ধশতাব্দীকালেরও বেশি সময় ধরে তিনি দেশের সব প্রজন্মের দর্শকের কাছে বহুল জনপ্রিয়। একুশে পদকসহ নানা সম্মাননায় ভূষিত এই গুণীজনের সাহিত্যভ্রমণও বেশ সমৃদ্ধ। কবিতা, স্মৃতিকথা, গল্প, উপন্যাস, কলাম-সংকলন মিলিয়ে এ-যাবৎ তার প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ২৬। ১০ সেপ্টেম্বর কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনার ৭৯ তম পর্বে তার আলোচনার নির্বাচিত অংশ তুলে ধরা হলো।

সময়টাতে দেশে রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি আমরা নানাভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনও চালিয়ে যাচ্ছিলাম। পশ্চিমা অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ আমরা শহিদ মিনারে, মাঠে-ময়দানে, রাস্তাঘাটে নাটক করতাম।

১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ আমাদের একটি নাটক মঞ্চস্থ করার কথা ছিল—*রক্ত দিলাম স্বাধীনতার জন্য*। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তার আগেই আমি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ি। একপর্যায়ে কোমায় চলে গেলাম। জ্ঞান ফিরলে দেখি—ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আমি একা শয্যাশায়ী। ডাক্তার-নার্স কেউ নেই। দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। শুনলাম আমার মেয়ে বিপাশা জন্মগ্রহণ করেছে। তখনও আমি ওকে দেখি নি।

মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে না পারার বেদনা তো ছিলই, সেইসাথে যে ঘটনাটা আমাকে ভীষণ ব্যথিত করল সেটা হলো, প্রফেসর ডা. ফজলে রাব্বীর মৃত্যু। ১৫ ডিসেম্বর তিনি স্বাধীনতা-বিরোধীদের হাতে অপহৃত ও নিহত হন। মাসকয়েক আগে তার চিকিৎসাতেই আমি সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম।

স্বাধীনতার পর চলচ্চিত্রেও অভিনয় শুরু করি। ১৯৭২ সালে আমার প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয়। ছবিটা ছিল বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের *তিতাস একটি নদীর নাম*।

পরবর্তীতে শিশুদের নিয়ে আমি কিছু নাটক রচনা ও নির্মাণ করেছি। কাজটা আমি উপভোগ করেছি। শিশুদের মনটাকে আমি বুঝতে চেয়েছি। আমরা শিশুদের বুঝি না, কারণ বুঝতে চাই না। ওদের ওপর জোর খাটাতে গিয়ে নানা মানসিক চাপ সৃষ্টি করি। এ ব্যাপারে আমি সচেতন হয়েছি আমার বাবাকে দেখে। আমার বাবা ছিলেন একজন সব্যসাচী মানুষ। বিচিত্র বিষয়ে ছিল তার জ্ঞান ও আগ্রহ। তিনি আমাকে বাগান করা, ছবি আঁকা, মাছ ধরা শিখিয়েছেন। কিন্তু কখনো কিছু চাপিয়ে দেন নি।

যে শিশুদের নিয়ে আমি কাজ করেছিলাম তারা অনেকেই এখন প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা। আমার খুব ভালো লাগে যে, অভিনয়ের পাশাপাশি কিছু শিল্পীও তৈরি করতে পেরেছি। জীবনের এ পর্যায়ে এই কাজগুলোই করতে চাই। নিজে যা শিখেছি, যেটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি সেটা ছড়িয়ে দিতে চাই। আর অক্লান্ত কাজ করে যাওয়ার জন্যে দরকার সুস্থ থাকা।

নিজেকে সুস্থ রাখতে আমি কিছু বিষয় মনে চলি। বাইরের কোনো খাবার আমি খাই না। ফাস্টফুড তরুণদের খুব পছন্দ, কিন্তু ফাস্টফুড ও চিনি দুটোই বিষ। চিনির উৎস হতে পারে ফল। বাংলাদেশের ওপর স্রষ্টার বিশেষ রহমত—আমাদের এত বিচিত্র ফল রয়েছে। এবং যে সময়ে যে ফল পাওয়া যায় সেই ঋতুর রোগের প্রতিষেধকও সেই ফল।

আর একটা কথা আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি—আমার কাজ ও পরিবার নিয়েই আমার জীবন। কাজের বাইরে যতটুকু সময়, সেটা আমার পরিবারের। আমার জীবনে কোনো আড্ডা বা ক্লাব কিছুই নেই।

কোয়ান্টামের একটা কথা আমার বেশ পছন্দের—*রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন*। ব্যক্তিগত জীবনেও এটা প্রয়োগ করে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আজ সমাজে বিশেষ অবদান রাখছে। ধর্মবর্ণনির্বিশেষে বহু মানুষ যোগ দিয়েছে কোয়ান্টামের এই মিলনমেলায়। এখানে এসে প্রশান্ত হওয়ার মাধ্যমে একজন মানুষ তার ভেতরের শক্তিকে উপলব্ধি করেন। ফলে তিনি যেমন উপকৃত হচ্ছেন, এগিয়ে যাচ্ছে জাতিও।

অনুলিখিত

সন্তানের ফ্রিন-আসক্তি ॥ আপনি কতটুকু সচেতন?



সন্তানের দুরন্তপনা সম্পর্কে আপনি অবগত। বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে ভেবে আছেন নিশ্চিন্তে। কিন্তু সে স্কুলে যেতে শুরু করলে ক্রমশ দৃশ্যমান হতে লাগল তার অস্বাভাবিক কিছু আচরণ—

অমনোযোগিতা, অগোছালো স্বভাব, অস্থিরতা ও জিনিসপত্র হারানো এবং সব কাজই অসমাপ্ত। স্কুলে তার ফলাফলও সন্তোষজনক নয়। শিক্ষকরাও অভিযোগ জানাচ্ছেন। এর মধ্যে একজনের কাছে গুনলেন এডিএইচডি সম্বন্ধে। যার সব উপসর্গই যেন মিলে যাচ্ছে সন্তানের সঙ্গে।

এডিএইচডি (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)। সহজ করে বললে নিজের মনোযোগের ওপরে কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকার এক বিভীষিকাময় রোগ। মনোযোগ ধরে রেখে গভীরভাবে ভাবতে পারে না বলে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত হয় ভুল, কাজ হয় এলোমেলো। ইদানীং এটি যেন পরিণত হয়েছে এক মহামারীতে। আগে দুয়েকজন এ রোগে আক্রান্ত শোনা গেলেও এখন বিশ্বব্যাপী এ এক আলোচিত বিষয়।

যখন থেকে এ মহামারীর শুরু

যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ মানুষ স্মার্টফোন আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে ২০০৭ থেকে। এরপর পরিলক্ষিত হয় বিশেষ কিছু পরিবর্তন—

কমতে শুরু করে শিক্ষার্থীদের

স্যাট স্কোর : যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ বোর্ডের রিপোর্ট মতে, ২০০৭ থেকে সে-দেশের শিক্ষার্থীদের গাণিতিক সমস্যা সমাধান ও লেখনী দক্ষতার গড় স্যাট স্কোর কমতে শুরু করে। ২০১৬-তে এসে শিক্ষার্থীদের স্যাট স্কোরের গড় দাঁড়ায় ৪৬ বছরের ইতিহাসে সর্বনিম্নে!

বাড়ছে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা : যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, সে-দেশে ২০০৭-এর চেয়ে ২০১১-তে এডিএইচডি আক্রান্ত শিশুর (২-৫ বছর বয়সী) সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৫০ ভাগ।

স্মার্টফোন ও সব ধরনের ফ্রিনই মূলত দায়ী

স্মার্টফোন ও ফ্রিন-আসক্তি শিশুর অস্থিরতার জন্যে আসলেই দায়ী কিনা, তা নিয়ে *জার্নাল অব দ্য আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন* একটি গবেষণা করে। লস অ্যাঞ্জেলেসের ২,৬০০ জন হাই স্কুল শিক্ষার্থীকে তারা পর্যবেক্ষণের জন্যে বেছে নেয়, যাদের ফ্রিন-আসক্তি একেবারেই নেই।

দুবছর তাদের বিভিন্ন ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হয়। এতে দেখা যায়, ৮১% শিক্ষার্থীই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্ত হয়ে পড়েছে। মাত্রাতিরিক্ত আসক্তদের ৫৩% আক্রান্ত

হয়েছে এডিএইচডি-তে। (সূত্র : *এনবিসি নিউজ*, ১৭ জুলাই ২০১৮)

চাই আশু সচেতনতা

দুরন্ত মানাই যে শিশু এডিএইচডি-তে ভুগছে তা নয়। আবার এসব উপসর্গ অবহেলা করারও সুযোগ নেই। তাই আক্রান্ত হওয়ার আগেই প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। আপনার সন্তান ফ্রিনের সামনে যত বেশি সময় থাকবে, তার মনোযোগ হবে তত বিক্ষিপ্ত। ফ্রিন-আসক্তি এ চক্রান্ত থেকে তাকে বাঁচাতে পারে আপনার সচেতন উদ্যোগ।

শিশুর বিকাশে মনোযোগী হোন

শিশুকে খেলাধুলা, দৈহিক পরিশ্রম ও ঘরের কাজে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করুন। বাস্তব জীবনমুখী হলে সে ভার্চুয়াল জগতে আসক্ত হবে না। আর বয়স ১৮ হওয়ার আগে সন্তানকে স্মার্টফোন দেবেন না।

এর পাশাপাশি শিশুকে বই পড়তে ও সেবামূলক কাজে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করুন, যা তার কল্পনাসক্তি ও মেধাকে শাণিত করবে। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে শিশু সন্তানকে সাথে নিয়ে অংশ নিন।

শিশু বিশেষজ্ঞরা যা বলছেন

ফ্রিন-আসক্তিতে মেধানাশ

ডা. আহমদ মরতুজা চৌধুরী



ফ্রিনে অভ্যস্ত শিশু ভার্চুয়াল জগৎ ও বাস্তবতার মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। বাস্তবতা বোঝার জন্যে শিশুর মস্তিষ্কে নিউরোনের যে সংযোগগুলো তৈরি হওয়া প্রয়োজন, ক্রমাগত ফ্রিনে তাকিয়ে থাকার ফলে তা হয় না। ফলে আবেগ-অনুভূতির ঘাটতি ও অসামাজিকতা দেখা যায় তার মাঝে।

মেধার প্রকৃত বিকাশের জন্যে মানুষ ও বাস্তব জিনিসের সংস্পর্শ প্রয়োজন। বই থেকে একটি কবিতা পড়ে শিশু তা কল্পনার রঙে রাঙায়। কখনো একটি লাঠিকে খেলনা বানিয়ে খেলে। এসবের মধ্য দিয়ে বাড়ে তার কল্পনাসক্তি। পরবর্তীতে সে পড়াশোনায়ও ভালো করে।

শিশুকে যদি ফ্রিনের সামনে বসিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করা হয়, কান্না থামাতে হাতে স্মার্টফোন দেয়া হয় তবে ক্রমেই সে আসক্ত হয়ে পড়ে। এই আসক্তিই শিশুর মেধানাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

[শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও লেখক। সাবেক সহযোগী অধ্যাপক, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল]

এসব আসক্তি থেকে আগে মা-বাবাকে মুক্ত হতে হবে

অধ্যাপক ডা. মনীষা ব্যানার্জী



বয়স বেড়েই চলেছে অথচ বাচ্চা কথা বলছে না—এই সমস্যা নিয়ে অভিভাবকরা প্রায়ই আমাদের কাছে আসছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদের কথা না বলার অন্যতম কারণ ফ্রিনের সামনে

মাত্রাতিরিক্ত সময় কাটানো।

ফ্রিনের সামনে শিশুদের কথা বলার কোনো প্রয়োজন হয় না, তারা শুধু দেখেই যায়। ফলে যোগাযোগটা হয় একমুখী। বাস্তবে পারস্পরিক ভাব বিনিময় হয় না বলে শিশুর ভাষাগত দক্ষতাও সৃষ্টি হয় না। ফলে সে কথা বলতে শেখে না।

তাই মা-বাবাকে আগে ফ্রিন-আসক্তি থেকে মুক্ত হতে হবে। এতে তারা সন্তানকে যেমন সময় দিতে পারবেন তেমনি তাকে ফ্রিন থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধও করতে পারবেন।

[শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও বিভাগীয় প্রধান, নবজাতক ইউনিট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল]

ফ্রিন থেকে দূরে রাখলেই আসবে ইতিবাচক পরিবর্তন

অধ্যাপক ডা. আবদ হোসেন মোল্লা

শিশুদের মধ্যে অটিজম ও এডিএইচডি-র মতো অসুস্থতার হার দিন দিন বেড়েই চলেছে। যে অভিভাবকরা এসব সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে আসেন, আমরা গবেষণায় দেখেছি, ৮৩% শিশুরই অসুস্থতার কারণ হলো ফ্রিন-আসক্তি।

এ শিশুদের শুধু ফ্রিন থেকে দূরে রেখেই আমরা তাদের আচরণে লক্ষ্য করছি ইতিবাচক পরিবর্তন। টিভি, মোবাইল, ট্যাবের সামনে বাচ্চাকে বসিয়ে মা-বাবা নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে যান। ভুলটা হয়ে যায় এখানেই। সন্তানের জন্যে সম্পদ গড়তে গিয়ে সেই সন্তানই যদি অসুস্থ হয়ে যায় তবে কী হবে সম্পদ দিয়ে? সন্তানকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে যথাযথ সময় দেয়া উচিত। কারণ সন্তানই মা-বাবার প্রকৃত সম্পদ।

[শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ও বিভাগীয় প্রধান, শিশু বিভাগ, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল]